দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ 27 OCT 2016 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক শিক্ষা : বাস্তবতা ও করণীয়

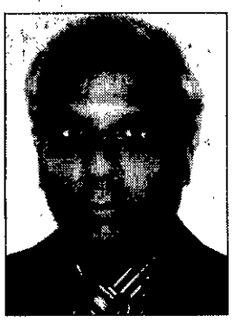

অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির

স্কুল পরিচালনায় তৃণমূলের জনগণকে নিয়ে আসতে হবে ওয়াচডগের ভূমিকায়। ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অভিভাবক পরিষদের সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা সেটা স্থানীয়দের জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে

দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় গত কয়েক বছরে বেশ অগ্রগতি হয়েছে। এর শুরুটা হয়েছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই। ১৯৭৩ সালে ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রযাত্রার শুভ সূচনা করেছিলেন তিনি। এরই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে প্রায় ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের গৃহীত আরও পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে তিন দফার প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি। এ কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের হাতে বছরের প্রথম দিনেই রঙিন বই তুলে দেওয়া, উপবৃত্তি কার্যক্রম, অনগ্রসর এলাকায় স্কুল ফিডিং চালু, সরকারি বিদ্যালয়ে দপ্তরি-কাম-প্রহরী নিয়োগ, স্টুডেন্টস কাউন্সিল গঠন প্রভৃতি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মানসিক বিকাশ ও খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করতে শিক্ষার্থীদের জন্য বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টসহ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। শিক্ষকের নতুন পদ সৃষ্টিসহ প্রায় ৮০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালু, পুল শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগও প্রশংসনীয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যালয়ে ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। গমনোপযোগী প্রায় শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি, শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমতা আনা, নতুন শিক্ষাক্রমে নতুন পাঠ্যবই, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা চালু, অবকাঠামোগত উন্নয়ন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই উন্নতি হয়েছে। কিন্তু এতকিছুর পরও মানের দিক দিয়ে এখনো অনেক পিছিয়ে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা। সময়টা পাল্টেছে। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে এখন গুণগত মানকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বাস্তবিকভাবেই গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষা এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। জাতীয় উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও গতিশীল সমাজ গঠনে গুণগত শিক্ষা চালকের ভূমিকা নিতে পারে। গুণগত ধারার এ শিক্ষার শুরু হতে হবে প্রাথমিক অবস্থা থেকেই। শিশুদের কচি মনে প্রকৃত শিক্ষার বীজটা বপন করে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষার প্রারম্ভিক পর্যায়। সন্দেহ নেই, প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে সব শিক্ষার মূল ভিত্তি।

ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদির পাশাপাশি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। এর মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, সংরক্ষণ ও প্রসার সম্ভব। একটি স্বনির্ভর জাতিগঠনের পূর্বশর্ত যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলা। আজকের কচি প্রাণ আগামী দিনের নেতা। কচি-কাঁচার এ দলকে যথোপযুক্ত ও যোগ্য করে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদেরই। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র ও এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক। প্রকৃত ব্যাপার হলো, শিক্ষকের এসব গুণাবলির অভাবে বা দক্ষ শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার মানোন্নয়নে গৃহীত কোনো পদক্ষেপই কাজে আসছে না।

সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে আমাদের জীবনধারা। একটা সময় ছিল, বাবা-মায়ের কাছে শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ শেষে বিদ্যালয়ে পাঠানো হতো শিশুদের। এখন বাবার সঙ্গে মায়েরও ব্যস্ততা বেড়েছে। চাকরি, সামাজিক দায়িত্ব, সংসার গোছানোসহ নানা কিছুতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন আমাদের মায়েরা। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অনেক মা তাদের সন্তানকে প্রাথমিক পাঠটুকুও দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। এসব ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রও চালু করেছে।

এসব প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকদের ভূমিকার ওপর নির্ভর করছে শিশুর গুণগত ও মানসম্পন্ন শিক্ষা পাওয়ার সুযোগটি। একজন শিক্ষক কেবল শ্রেণিকক্ষের নির্দেশকই নন, প্রাথমিক পর্যায়ের একজন শিক্ষক সারাজীবন শিক্ষার্থীর মানসপটে স্মৃতি হয়ে থাকেন। শিক্ষার্থীর সামগ্রিক জীবনেই তিনি পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করেন। এ কারণে একজন শিক্ষককে আরও অনেক গুণাবলির সমন্বয় ঘটাতে হয়। তিনি শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করবেন। পড়াবেন নির্ভুল উচ্চারণ ও সঠিক রীতিতে। কচি মনের একটি শিশু অবচেতন মনে যা আয়ত্ত করবে, বাকিটা জীবন সে সেটাই চাষাবাদ করবে। কেবল পাঠ্যক্রমের নির্ধারিত বই নয়, শিশুদের নানা বইয়ের প্রাসঙ্গিক পাঠদান করতে হয়। পড়ার আগ্রহ বিনোদনের সঙ্গে ছোটবেলাতেই তার মনে বপে দিতে হবে। পড়াশোনা বা ভালো ফলাফলই কেবল একজন শিক্ষার্থীকে ভালো মানুষ করে গড়ে তোলে না, মানবিক গুণাবলিও পরিপূর্ণ মানুষের জন্য অপরিহার্য– বিষয়টি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে হবে। সদা সত্য বলা, মানুষের বিপদে এগিয়ে যাওয়ার পাঠটিও ছোট মনেই দিতে হয়। আবার কেবল পাঠ্যবই, পাঠ্যক্রম বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতই জীবনের গণ্ডি নয়। এর বাইরেও একটি জগৎ রয়েছে। যে জগতে কুলি-মজুর, রিকশাচালক, কৃষক থেকে বড় আমলা, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতিসহ সব শ্রেণির মানুষ থাকেন। সে জগতে নিজেকে যথেষ্ট বিনয়ী হতে হয়– বিনয়ের এই পাঠের প্রারম্ভিক পর্যায় সেই শিক্ষকের হাতেই। পড়ার বাইরে রয়েছে খেলাধুলা, গান, কবিতা, নাটক, চলচ্চিত্রসহ বিনোদনের আরও নানা অনুষঙ্গ। এগুলো মানুষের মনকে আরও মানবিক করে তোলে। নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলা শরীরকে সুস্থ রাখে। এই বিষয়গুলো কোনো কোনো পরিবারে মা-বাবা বা পরিবারের অন্য সদস্যরা বলে থাকেন হয়তো। কিন্তু শিশুর মনে শিক্ষকের কথাই দাগ কাটে বেশি। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক বলেছেন, তুমি বাবা জানো না– আধো বুলিতে শিশুদের মুখ থেকে প্রায়ই এ ধরনের কথা শোনা যায়। শিক্ষক যদি কোনোভাবে অস্পষ্ট বা ভুল বিষয় পড়ান, কচি মনের সেই শিশুটি তার জীবনে অনেকদিন সেটাকেই সত্য বলে মনে করবে। মহাসড়কে দ্রুতগতির বাসের চালকের হাতে জীবনটা সঁপে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত বা চিন্তাহীন মনে ভ্রমণ করি। চালকের সামান্য হেঁয়ালি বা ভুলে চলে যেতে পারে অসংখ্য মূল্যবান জীবন। একই রকম বিষয় প্রাথমিক শিক্ষকদের বেলায়ও। সমৃদ্ধ ও উন্নত আগামীর বিনির্মাণে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও আধুনিকায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। রূপকল্প ২০২১ বা জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য জনসম্পদ উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। সুনাগরিক সৃষ্টিতে এবং প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে সব শিশুর মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা এবং একই সঙ্গে তাদের উচ্চতর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চত করা একান্ত জরুরি। শিশুর সার্বিক বিকাশের সিংহভাগ নির্ভর করে বিদ্যালয়ের আনন্দঘন পরিবেশ, শিক্ষকের দক্ষতা ও শিখন শেখানো কার্যক্রমের ওপর। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের আন্তরিকতা এবং শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার প্রতি লক্ষ রাখার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকরা যদি ভুল ভাষার ব্যবহারে কথা বলেন, ভুল উচ্চারণে ইংরেজি চর্চা করেন, ভুল পদ্ধতিতে অঙ্ক কষেন, তবে শিক্ষার্থীর ওপরও সহজেই নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যেও আজকাল এসব ক্ষেত্রে প্রায়োগিক জ্ঞানের অভাব লক্ষ করা যায়। শুরুতে ভুলভাবে শিখেছিলেন বলে পরে তাদের পক্ষে আর ঠিক করা হয়ে ওঠেনি। এখন সময় দ্রুতগতিতে ধাবমান। একবার ভুল দিয়ে শুরু করলে পরে শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে সেটি শোধরানোর ফুরসত পাওয়া কঠিন। প্রাথমিক অবস্থায় গুণগত, মানসম্পন্ন ও সঠিক শিক্ষাটাই দেওয়া উচিত। অন্তত এ ক্ষেত্রে এতটুকু ছাড় দেওয়া মানে সমৃদ্ধ জাতিগঠনে ঠিক ততটুকুই পিছিয়ে পড়া।

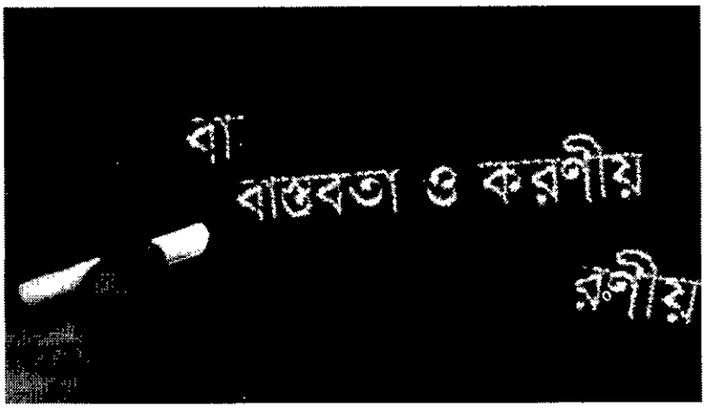

আমাদের দেশের বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। দেশের সার্বিক অবস্থার বিবেচনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় অনেকেই আগ্রহী হন না। তবে এ আগ্রহের ধরনে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের বেতন-কাঠামো আকর্ষণীয় ও সন্তোষজনক করা, নিয়োগ-প্রক্রিয়া সুষ্ঠু করা এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণের বর্তমান ধারার সংস্কার করা জরুরি। আশার কথা হলো, সরকার এ ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

বর্তমান সরকার প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে যে কয়েকটি খুব ভালো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদটি দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীতকরণ এর অন্যতম উদাহরণ। এর ফলে এই শিক্ষকরা তুলনামূলক বেশি বেতনভাতাসহ সুবিধাদি পাবেন। চলতি বছর ৩৪তম বিসিএসে উত্তীর্ণ ৮৯৮ জনকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগের সুপারিশ করেছে সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি)। এসব প্রার্থীকে দ্বিতীয় শ্রেণির নন-ক্যাডার পদমর্যাদায় নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও গুণগত শিক্ষার ধারা নিশ্চিত করতে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ নিয়মে শিক্ষকদের বেতন স্কেল, সামাজিক মর্যাদা, অন্য সুযোগ-সুবিধা বেড়েছে। আরেকটি বড় ব্যাপার হলো, শিক্ষার্থীর নিজের উপজেলায় প্রধান শিক্ষক হিসেবে চাকরি করার বিধান। গ্রামের বাড়ির প্রতি আমাদের সবারই একটা টান থাকে। অনেক অভিভাবকসহ চাকরিপ্রার্থীরাও প্রত্যাশা করেন, যদি গ্রামের বাড়ি থেকে চাকরি করা যেত! সরকার সেই সুযোগটি এনে দিয়েছে। এর ফলে বিসিএসের মতো কঠিন চাকরির পরীক্ষায় নিজের মেধার পরীক্ষা দিয়েই শিক্ষার্থীদের এই পদে আসতে হবে। মেধাবী শিক্ষকদের কমিটমেন্টের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান অনেক বেশি বেড়ে যাবে। তবে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মান আরও বাড়ানো উচিত। চলমান পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে যে ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে, তা আরও আধুনিকায়ন করা অত্যাবশ্যক। এই অত্যাবশ্যকের প্রেক্ষাপট আগেই বলেছি। প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকদের শুধু তাত্ত্বিকভাবে পড়ানোর প্রশিক্ষণ কাজে আসে না। এভাবে পড়াতে হবে বা ওভাবে, এসব না বলে, হাতে-কলমে শিখিয়ে দিতে হবে। হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সম্প্রতি ইউনেস্কোর এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল ব্যুরো ফর এডুকেশন বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাবেই শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। প্রশিক্ষিত শিক্ষকের হার নেপালে ৯০ শতাংশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় ৮২ শতাংশ, মালদ্বীপে ৭৮ শতাংশ, মিয়ানমারে ১০০ শতাংশ। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিদিন ১২ থেকে ১৩ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষক স্কুলে অনুপস্থিত থাকেন। এর সঙ্গে শিক্ষকদের যেমন পেশার প্রতি আগ্রহ, নীতি-নৈতিকতা ও কমিটমেন্টের প্রশ্ন জড়িত, তেমনি যথাযথ কর্তৃপক্ষেরও দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্যমতে, দেশে ২৪ ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এর সংখ্যা এক লাখেরও বেশি। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক আছেন পৌনে পাঁচ লাখ। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের এনজিও পরিচালিত স্কুল, বেসরকারি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেন রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রায় এক কোটি ৯৫ লাখ ৮৪ হাজার শিশু পড়ালেখা করে। সরকারি প্রাথমিক (৬৩ হাজারের বেশি) বিদ্যালয়ে প্রায় সোয়া তিন লাখ শিক্ষক আছেন, যাদের ৬৪ শতাংশই নারী। এই বিশালসংখ্যক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা যেমন কাঙ্ক্ষিত মানের নয়, তেমনি এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা-অবকাঠামোগত অবস্থারও কাঙ্ক্ষিত মান নিশ্চিত হয়নি।

এগুলো সমাধানের পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও মানসম্মত করতে হলে এর বিকেন্দ্রীকরণ ও সার্বিক অংশগ্রহণ খুব জরুরি। এ জন্য এলাকাভিত্তিক তথা উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা করে এগোতে হবে। স্কুল পরিচালনায় তৃণমূলের জনগণকে নিয়ে আসতে হবে ওয়াচডগের ভূমিকায়। ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অভিভাবক পরিষদের সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা সেটা স্থানীয়দের জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, অভিভাবক কমিটি ও ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির মধ্যে সমন্বয়ের ওপরও জোর দিতে হবে।

লেখক : সদস্য, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন, সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। skabir_ju@yahoo.com